ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

শিক্ষাচর্চায় মোগল শাসকদের অবদান : একটি পর্যালোচনা

ড. মো: হুমায়ুন কবীর*
মো: মামুনুর রশিদ**

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষে মোগল বিজয় মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। বাবরের রাজকীয় পরিবারের উদ্যোগে শিক্ষার প্রতি নিয়মিত যে উৎসাহ প্রদর্শন করা হয়েছিল তা মুসলমানদের ভারত–শাসনের ইতিহাসে বিরল। কারণ, এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মোগল রাজদরবার শুর থেকেই জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এই রাজদরবার সমগ্র পূর্ব গোলার্ধে তার ঔদার্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাইরে থেকে যেসব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতার আশায় রাজদরবারে আসতেন, মোগল শাসকরা তাদের আন্ড রিকতার সাথে গ্রহণ করতেন। উলেণ্টখ্য ভারতবর্ষে মোগল শাসন তিনশত বছরেরও অধিককাল (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) পর্যন্ড় স্থায়ী ছিল। এ সময়ে মোগল শাসকেরা উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রেও যে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তা এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর থেকে আওরঙ্গজেব (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.) পর্যন্ড় নেয়া হয়েছে।

ভূমিকা : ভারতবর্ষ শাসনকল্পে যুগে যুগে যে সব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে মোগলরা ছিল অন্যতম। জহীর উদ-দীন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় স্থায়ী হয়েছিল।[১] এই সুদীর্ঘ শাসনকালে মোগলরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ড় অবদান রেখেছিলেন তা উপমহাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে প্রজাপালন এবং জনকল্যাণকামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল মোগল সম্রাটদের লক্ষ্য। তাঁরা শিক্ষাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। উলেণ্টখ্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মোগল পূর্ব আমলের শিক্ষাচর্চার চেয়ে মোগল যুগের শিক্ষাচর্চা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সমৃদ্ধ ছিল।

সমসাময়িক যুগের অন্যতম প্রধান বিদ্যোৎসাহী শাসক হিসেবে ইতিহাসে বাবরকে উচ্চাসন দেয়া হয়। তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি

* প্রভাষক, এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি অব বাংলাদেশ।
** গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আত্মজীবনীকারদের শিরোমণি। কথিত আছে যে, তিনি নতুন ধরনের হস্ড়লিপির আবিষ্কর্তা। যাকে তার নামানুসারে 'বাবরি' আখ্যায়িত করা হয়।[২] শুধু তাই নয়, কবি হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।[৩] ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। বিশেষ করে তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান-পিপাসু হওয়ার পাশাপাশি আইন শাস্ত্রের ওপর তাঁর পা িত্য ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'সুরহাতে আম' বা জনকর্ম বিভাগের আওতাধীন গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ড় হয়েছিল।[৪] মোট কথা, বাবরের রাজত্বকালে শিক্ষাচর্চা তৎকালীন সময়ে গভীর অনুপ্রেরণার সাক্ষ্য বহন করেছিল।

বাবরের উত্তরাধিকারী **হুমায়ুন** (১৫৩০-১৫৪০ খ্রি.) (১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.) একজন পুস্ড়ক সংগ্রাহক ও পাঠানুরাগী ছিলেন। রাজকীয় পুস্ড়কাগারের জন্য তিনি বহু পুস্ড়ক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থপ্রীতি এত বেশী ছিল যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একখানা সুনির্বাচিত গ্রন্থাগার সঙ্গে থাকত।[৫] কাউন্ট নুয়ের (Count Noer) ভাষ্যানুযায়ী, ভারত ত্যাগের সময় তিনি তাঁর প্রিয় গ্রন্থগুলো ও বিশ্বস্ড় গ্রন্থাগারিক রাজ বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শের শাহের 'প্রমোদ ভবনকে' তাঁর নির্দেশে লাইব্রেরীতে রূপান্ড়র করা হয়েছিল।[৬] হুমায়ুন তাঁর বাবার দীক্ষায় অনুপ্রাণীত হয়ে তুর্কি, ফার্সি সাহিত্যে, দর্শন শাস্ত্রে এবং ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রের একজন জ্ঞানান্বেষণকারী ছিলেন। গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[৭] এজন্য বলতে পারি যে, রাজ্যে শিক্ষা বিস্ড়ারের ক্ষেত্রে তিনি মূলত পিতার অনুসৃত শিক্ষানীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে দিলণ্টীসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। হুমায়ুনের বিদ্যানুরাগীর পরিচয় তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ড় পরিলক্ষিত হয়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে জানুয়ারি তিনি তাঁর লাইব্রেরি থেকে আজানের শব্দ শুনে দ্র ত নামতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।[৮] শিক্ষা বিস্ড়ারে হুমায়ুনের মহিষী বেগা বেগম হুমায়ুনের সমাধির কাছেই মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৯]

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করার পর থেকে পিতার দুর্যোগ দেখা দেয়ায় বিদ্যা শিক্ষা করতে না পারলেও তিনি শিক্ষাচর্চার প্রতি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[১০] সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করেন। আকবর উপযুক্ত প ি তদিগকে নিযুক্ত করতেন। সম্রাটের আগ্রহে প ি তেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন পুস্ড়ক পড়ে শোনাতেন।[১১] এছাড়া সম্রাট আকবর একটি অনুবাদ বিভাগ গঠন করেন এবং বিখ্যাত প ি তেরা এই বিভাগে নিযুক্ত থেকে আরবি, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিকসহ বিভিন্ন ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্ড়কসমূহ অনুবাদ করতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই তিনি ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আরবি ও ফার্সি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে অনেক হিন্দু ও মুসলমান প ি ত নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের তত্ত্বাবধানে রামায়ণ, রাজতরঙ্গিনী, ভাগবতগীতা, মহাভারতসহ অনেক

হিন্দু আকর গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়।[১২] আকবরের উৎসাহে হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এই সময়েই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বীরবল, তুলসী দাস ও সুর দাস। আবুল ফজলের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সম্রাটের দরবারে একুশ জন পন্ডিতের অবস্থান ছিল। এঁদের মধ্যে নয় জন ছিলেন হিন্দু।[১৩] মৌলিক গবেষণা ও পান্ডিত্যের জন্য সম্রাট আকবর তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। এমনকি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে কাব্য, ইতিহাস ও অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ চর্চা সাধনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবারনামা', বাদাউনীর 'মুন্তাখাব উত-তওয়ারিখ' নিযামুদ্দীনের 'তবাকাত-ই-আকবরী' প্রভৃতি উলেণ্ঢখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়।[১৪] মূলত তাঁর আমলেই আধুনিক ইতিহাসচর্চার যুগ শুরু হয়। শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাঁর অবিচল আকর্ষণ সাহিত্যপ্রীতিরই বহিঃপ্রকাশ যা মোগল শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম এমনকি বিজ্ঞানের ওপরও পুস্ড়ক সংকলিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যে শিক্ষা বিস্ড়ারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকবর অনুভব করেছিলেন, একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্য তাঁর নির্দেশে আবাসিক ও অনাবাসিক ব্যক্তির জন্য অসংখ্য 'মক্তব' ও 'মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেগুলোর জন্য প্রচুর জমি-জিরাত প্রদান করা হয়েছিল।[১৫] এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও উলেণ্ঢখযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল ফতেহপুর সিক্রি শহরে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয় যে, এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য আর দ্বিতীয়টি ছিল না। মেধাবী ছাত্রদের যেমন স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ প্রদান করা হত তেমনি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা পয়সায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। আর্থিক সুবিধার উদ্দেশ্যে টোডরমল তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের জন্য ফারসী ভাষা আবশ্যিক করেছিলেন, ফলে এখন ভারতীয়রা যে উৎসাহ নিয়ে ইংরেজী শিখছেন, সেদিন হিন্দুরাও একই উদ্দীপনা নিয়ে ফার্সি শিখতেন। তাই মোগল শাসনব্যবস্থায় হিন্দুরাও মুসলমানদের সঙ্গে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করতে পেরেছিলেন।

ষোড়শ শতকে বিশ্বের কোথাও রাষ্ট্রীয় সরকার শিক্ষা সংক্রান্ড় বিষয়কে তাদের দায়িত্বের অংশ মনে করেনি। ইংল্যান্ডের মতো দেশও প্রথম শিক্ষা সংক্রান্ড় নীতি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে মেনে নেয় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এ দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে সম্রাট আকবর তাঁর সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।[১৬] আকবরের সাম্রাজ্যে অনেক প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার তথ্য পাওয়া যায়। এগুলোর কিছু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কিছু দানশীল ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। এযুগে প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব। এখানে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও ধাপে ধাপে গণিত, কুরআন প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতো। সে সময় আকবর ফতেহপুর সিক্রি, আগ্রা, দিলণ্ঢী এবং আরও কিছু অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।[১৭] আকবরের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দরবারের অভিজাতগণকেও উৎসাহিত করেছিল। মোগল

নারীগণও জনগণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[১৮] তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম আনগা দিলণ্ঢীতে 'খায়রুল মঞ্জিলে' মসজিদের পাশে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।[১৯] খাজা মুনিম দিলণ্ঢীতে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এ ধরনের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে মুসলিম অধ্যুষিত বড় বড় শহরে। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আইন, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো এবং শিক্ষকদের অনেকেই ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন। সম্রাট আকবরের সময় সাম্রাজ্যের সর্বত্র হিন্দুদের প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তুর্কি আক্রমণের সময় হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু ধ্বংস হলেও সম্রাট আকবরের সময় সেগুলোর পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। এ সময় গ্রামে মন্দির- সংশিণ্ঢষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পাঠ ছাড়াও গণিত ও ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ানো হতো। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যতালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত ছিল হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, উচ্চতর গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। সম্রাট আকবর পাঠক্রম সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান পাঠ্যতালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত করেন। এগুলোর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য ছিল নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কিত পাঠ, গণিত, কৃষি, জ্যামিতি, শরীরবিদ্যা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি।[২০] সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে আকবর ব্যাকরণ, দর্শন, বেদান্ড় ও পতঞ্জলীর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ সমস্ড় বিষয় ধাপে ধাপে শিক্ষা দেয়া হতো। ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসে আকবরের সময় প্রথমবারের মতো হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীরা একই স্কুলে অভিন্ন পাঠক্রমে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিল। আকবরের দরবার শিক্ষা ও জ্ঞানের তীর্থকেন্দ্র ছিল। সম্রাট ও তাঁর সভাষদগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২১]

ভারতের ইতিহাসে মোগল সম্রাটদের মধ্যে **জাহাঙ্গীর** (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম। বাবর ও আকবরের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও জাহাঙ্গীর তাঁর সংস্কৃতিবান চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি যেমন একজন পন্ডিত ছিলেন, তেমনি কবি হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনিও তাঁর পিতামহের মতো এক "আত্মজীবনীমূলক" গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন, যা মধ্যযুগের ভারত–ইতিহাসের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে এক অমূল্য সম্পদ।[২২] তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের বন্ধু হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর প্রবল আগ্রহের কথা জানা যায়।[২৩] এছাড়াও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাব্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায়। তিনি যেসব সভাপন্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁরা হলেন, ১. নেয়ামত উলণ্ঢাহ [জাহাঙ্গীরের ইতিহাস লেখক, তিনি আফগানদের ইতিহাস রচনা করেছিলেন] ২. মির্জা গিয়াস বেগ [একজন শ্রেষ্ঠ অংকবিদ, তিনি রচনাসৌকর্যের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন] ৩. আবদুল হক দেহলভী [তিনি হিন্দুস্থানের শেখদের জীবনকাহিনী রচনা করেছিলেন] এবং ৪. নকিবখান [রাজসভার সর্বাধিক সম্মানিত ইতিহাসবিদ]। কবিদের মধ্যে, বাবা তালিব

ইস্পাহানি, ফাসুনী কাশি, মির কাশিম কাশি, মোলণ্ঢা হায়দার খাসালি, মোলণ্ঢা মোহাম্মদ শফী মাজান্দ্রানী, মোলণ্ঢা নাজিরি নিশাপুরি, সাদা- এ গিলানী ও শায়দা।[২৪]

জাহাঙ্গীর শিক্ষা বিস্ড়ারের ক্ষেত্রে এতো উৎসাহী ছিলেন যে, সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব বিলুপ্ত প্রায় 'মক্তব ও মাদ্রাসা'র সংস্কার সাধন করেন। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ করে তোলেন। তাঁর নির্দেশে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিকে নতুন নতুন গ্রন্থের দ্বারা সজ্জিত করা হয়। জাহাঙ্গীর এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন যে, কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মারা গেলে তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হবে।[২৫] তৎকালীন সময়ে জাহাঙ্গীরের এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষা বিস্ড়ারের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারি ভূমিকা রেখেছিল।

সম্রাট **শাহজাহান** (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.) তাঁর রাজ্যে জনগণের সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষা ছিল অন্যতম। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। আরবী, ফার্সি ও হিন্দী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর রাজ দরবারে কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত ও শিল্পীরা যথারীতি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি সকলকে সম্মাননা প্রদান করতেন। তাঁর দরবারে সর্বাধিক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন আব্দুল হাকিম সিয়ালকোটি, আব্দুল হামিদ লাহোরী, মৌলানা মুহিব আলী সৈয়াদি, মীর আব্দুল কাশিম।[২৬] তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোহ ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হিন্দুদের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার একজন সমজদার ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করেন।[২৭] শিক্ষা প্রসারকল্পে বহু বিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। 'দারউল বাকা' নামক সুদৃশ্য মাদ্রাসাটি তিনি পুনর্নির্মাণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি রাজ্যের উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী, পণ্ডিত ও উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন ও বিবেকবান ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দিলণ্ঢী জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে তিনি প্রসিদ্ধ ইম্পেরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক বি.পি. সাকসেনার মতে, তিনি দিলণ্ঢী ও আগ্রায় অবস্থিত কলেজসমূহের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন।[২৮] শাহজাহানের কন্যা জাহানারা শিক্ষা বিস্ড়ারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আগ্রার জুমা মসজিদের নিকট একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।[২৯] মূলত স্থাপত্য শিল্পে অবদানের জন্য তাঁর শাসনকালকে মোগল যুগের স্বর্ণযুগ বলা হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল উলেণ্ঢখযোগ্য।

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) ব্যক্তিগতভাবে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[৩০] তিনি নীতিবিদ্যা, আইন ও ফারসি সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। কুরআন তাঁর মুখস্থ ছিল এবং সুন্দর হস্ড়াক্ষর ছিল তাঁর। নিজ হাতে কোরানের আয়াত নকল করে এবং টুপির ওপর আপন হাতে সূচীকর্ম করে সেগুলো বিক্রি করে তিনি জীবন ধারণ করতেন।[৩১] আওরঙ্গজেব বিদ্যানুরাগী হয়ে তাঁর রাজত্বে বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি জনগণের শিক্ষাকে কখনো উপেক্ষা করেননি বরং তাদের শিক্ষা

গ্রহণকে রাষ্ট্রের উন্নতির একটি বিশেষ উপাদান বলে মনে করতেন। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে যত্ন নেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে ফরমান জারি করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি একটি ফরমান জারি করেন যাতে তিনি গুজরাটের দেওয়ানকে আদেশ দেন যে, প্রত্যেক বছর প্রদেশের সদরের সুপারিশক্রমে এবং শিক্ষকের সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রীয় খরচে যেন শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় এবং ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।[৩২] আওরঙ্গজেব শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য দৈনিক শিক্ষাভাতার প্রচলন করেছিলেন। সম্রাট যেহেতু ইসলামী আইন ও ধর্মতত্ত্বে গভীরভাবে উৎসাহী ছিলেন, সেহেতু তাঁর নির্দেশে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী জ্ঞানের ওপর অনেক বই আমদানি করা হয়েছিল। বিখ্যাত "ফতোয়ায়ে আলমগিরী" তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে একাধিক ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনজ্ঞদের দিয়ে রচিত হয় এবং সে গ্রন্থ ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে স্থাপন করা হয়। এটি মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ এবং বর্তমানেও বিচারক ও বিচারালয়ের জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য।[৩৩] তাঁর সময় খানকাসমূহ সরকার হতে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ পেত ও খানকাসমূহের দায়িত্ব ছিল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বিস্ড়ার করা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজে শিক্ষা মাধ্যম তাঁর নিজস্ব শিক্ষানীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থাটি ফলোৎপাদক এবং জ্ঞান প্রসারের সহায়ক হয়েছিল। উলেণ্ঢখ করা যেতে পারে মোগল যুগে কেন্দ্রে এবং স্থানীয় শাসকদের আনুকূল্যে নানা ভাষার চর্চা হয়েছে তবে ফার্সি রাজভাষা হওয়ায় সাহিত্য রচনায় ক্ষেত্রে এ ভাষার অগ্রাধিকার লক্ষ্য করা যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের দু'শ বছরে কলা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল, তা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই, এই বিরাট প্রগতির পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল শিক্ষা, যা মোগল সম্রাটদের প্রচেষ্টার ফল। এটি তাঁদের শিক্ষানুরাগেরই প্রমাণ। অতএব মোগল শিক্ষা যদি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে থাকে, তবে তা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, এসব সম্রাট শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁরা সমকালীন ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে বার বার অতিক্রম করে গেছেন।

উপসংহার

মধ্যযুগীয় ইউরোপের ন্যায় মোগল ভারতেও শিক্ষা ছিল ধর্মের একটি অংশ। রাষ্ট্রের শিক্ষার খরচ বহন করা হত দান–খয়রাতের তহবিল হতে। এই আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা যদিও আধুনিককালের মত ছিল না, কিন্তু শাসকগণ সর্বদাই শিক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন। রাজা বা অভিজাত শ্রেণী, সাধারণত মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় লোকদিগকে প্রায়ই মুক্ত হস্ড়ে দান করতেন। ফলে মসজিদ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে মক্তব এবং হিন্দু সংস্কৃত ও মাতৃভাষার বিদ্যালয়সমূহ গড়ে উঠে। মোগল যুগে কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কাঠামো না থাকলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার অস্ড়িত্বের কথা জানা যায়। প্রত্যেক মোগল সম্রাটই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

উঠেছিল। রাজান্তঃপুরের ভেতরে থাকা বিদুষী মোগল মহিলাগণও কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এক্ষেত্রে বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম থেকে আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবউননিসা পর্যন্ত রাজপরিবারের বহু বিদুষী ও লেখিকা তাঁদের লেখনির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। মোগল শাসকগণ শিক্ষানুরাগী হলেও শিক্ষার প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতা দেখান সম্রাট আকবর। সুলতানি যুগের মতো মোগল যুগেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠশালা ও টোলের অস্তিত্ব ছিল। আকবর গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে একে ধর্মনিরপেক্ষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ধারা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ও অব্যাহত ছিল। বর্তমানকালে যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উচ্চারিত হচ্ছে মূলত এই প্রত্যয়টির পুরোধা ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল সম্রাট আকবর। এভাবে শিক্ষাচর্চায় মোগল শাসকদের অবদান স্মরণীয়।

তথ্যনির্দেশ

১ R.C. Majumdar, H.C. Raychoudhury and Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India*, London: Macmillan and Co. Ltd, 1961, p.p. 781-782.

২ Elloit and Dowson, History of India as told by its own Historians, Vol. IV, Allahabad: Kitab Mahal Pvt. Ltd., 1964, p. 219; হাসান শরীফ, মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডচিত্র, ঢাকা: অ্যাডার্ন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ১২৩-১২৪।

৩ S. M Jaffar, *The Mughal Empire From Babar to Aurangzeb*, Delhi: Ess Ess publications, 1974, p. 28.

৪ এস. এম. জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা* (১০০০-১৮০০) অনুবাদ, রশীদ আল ফারুকী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪৭।

৫ তদেব।

৬ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত) কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯০, পৃ. ৬।

৭ Badaoni, *Muntakhabu't-Tawarikh*, tra. George S.A. Ranking, Vol. I, Delhi: Idarah-Adabiyat-I-Delhi, 1973, p. 602.

৮ তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত মুঘল আমল*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ২২৮।

৯ শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৮।

১০ মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ১৯৭৪, পৃ. 73|

১১ ডক্টর আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৪৮৬।

১২ আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*, অনূদিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা: কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন, প্রা. লিমি. ১৩৯৪, পৃ. ৪২।

১৩ এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ: মোগল পর্ব*, ঢাকা: প্রতীক ২০০৭, পৃ. ১০২।

১৪ মোহাম্মদ গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১৫ এস. এম. জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

১৬ এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

১৭ তদেব।

১৮ সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, *বাংলার সমাজে মুসলিম নারী: একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, (১৯০০-১৯৪৭) অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৬০।

১৯ Rekha Misra, *Women in Mughal India*, Delhi: Munshiram Manoharal, Oriental Publishers and Books Sellers, 1967, p.p. 91-92.

২০ এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

২১ আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

২২ তেসলিম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

২৩ Beni Prasad, *History of Jahangir*, Allahabad: The Indian Press Publications Pvt. Ltd. 1962, p. 20.

২৪ এস. এম. জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৫ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

২৬ এস.এম. জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৭ Elloit and Dowson, Vol. VII, op. cit, p. 179.

২৮ B.P. Saksena, *History of Sahjahan of Delhi*, Allahabad: Central Book Depot. 1962, p. 247.

২৯ Rekha Misra, op.cit, p.91.

৩০ Zahiruddin Faruk, *Aurangzeb and his Times*, Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1935, pp. 543-544.

৩১ উদ্ধৃত: প্রেমময় দাশগুপ্ত (সংকলিত), *ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত*, কলকাতা: ফার্মা কে এলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ২২৪।

৩২ শিবলী নো'মানী, *আওরঙ্গজেবঃ চরিত্র বিচার*, অনূদিত হাসান আলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১২২।

৩৩ গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ. ১০৬।